দুর্গাপূজা ও দুর্গোৎসব

নারায়ণচন্দ্র সরকার

মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী দুর্গাকে মহামাতা এবং বিষ্ণুর পরমাশক্তি বলা হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে আছে যে মহাশক্তি মূল প্রকৃতি থেকে বিশ্ব উৎপন্ন এবং তিনিই বিশ্বপ্রপঞ্চের সারভূতা পরা সত্তা। এই মহাশক্তির আরাধনা ভারত তথা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে হয়ে আসছে পাঁচ হাজার বছর আগে থেকে। পঞ্জাবের হরপ্পা এবং সিন্ধুদেশের মহেঞ্জোদারো নগরে যে দেবীপূজা হতো তার ধংসাবশেষ সিন্ধুনদের ভূগর্ভ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। দেবী ছিলেন এই দুটি নগরের অধিবাসীদের প্রধান দেবতা।

বৈদিক যুগেও শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্ত এবং সামবেদের রাত্রিসূক্ত থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক যুগে শক্তিবাদ প্রচলিত ছিল।

হিন্দুতন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধতন্ত্রের অসংখ্য গ্রন্থ আছে। চিনদেশীয় ত্রিপিটকে (বৌদ্ধশাস্ত্রে) শক্তিবাদ এবং শক্তি আরাধনার কথা বলা আছে। ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাঁর Introduction to Buddhist Esotericism গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, হিন্দুতন্ত্র নানা বিষয়ে বৌদ্ধতন্ত্রের নিকট ঋণী।

জাপানে এক বৌদ্ধ দেবী পূজিতা হন। এই দেবীর নাম 'সপ্তকোটি বুদ্ধমাতৃকা চনষ্টী দেবী বা কোটিশ্রী'। জাপানি ভাষায় চনষ্টী শব্দ এবং সংস্কৃত চণ্ডী শব্দ সমার্থক। বৌদ্ধধর্মের মারীচি দেবীও দশভুজা। তিব্বতী লামাগণ মারীচি দেবীকে ঊষাদেবীরূপে আরাধনা করে থাকেন। চিনের ক্যান্টন শহরে অবস্থিত বৌদ্ধমন্দিরে একটি শতভূজা দেবীমূর্তি আছে।

জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর স্বহস্তে লিখিত একখানি চণ্ডী নেপালে পাওয়া গিয়েছে। এই পুস্তক এক হাজার বৎসর পূর্বে লিখিত। নেপালের সর্বত্র দেবীপূজা হয়ে আসছে প্রাচীনকাল থেকে।

জৈনধর্মেও শক্তিবাদ প্রবেশ করেছিল। রাজপুতানার আবু পাহাড়ের বিখ্যাত জৈন মন্দিরের চূড়ায় ষোলটি জৈন দেবীর বিভিন্ন মূর্তি খোদিত আছে।

গুরুগোবিন্দ সিংহের 'দশন বাদশাহ কি গ্রন্থ' -এর চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংশে শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথা আছে। এই গ্রন্থের চতুর্থ অংশ প্রায় মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অনুসারেই লিখিত। এতে মধুকৈটভ, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, শুম্ভনিশুম্ভাদি দৈত্যবধের বিবরণ আছে। উক্ত গ্রন্থে পঞ্চম অংশে চণ্ডীচরিত্র এবং ষষ্ঠ অংশে চণ্ডীস্তব আছে।

অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্মেই শক্তিবাদ এবং দেবী আরাধনা সমধিক প্রচলিত। হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্র সুবিশাল। মহাসিদ্ধসার তন্ত্রমন্ত্রে এই জগৎ বিষ্ণুক্রান্তা, রথক্রান্তা অ অশ্বক্রান্তা এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। শক্তিমঙ্গল তন্ত্রমতে বিন্ধ্যপর্বত থেকে পূর্বদিকে যবদ্বীপ পর্যন্ত সকল দেশ বিষ্ণুক্রান্ত এবং বিন্ধ্যপর্বত থেকে পশ্চিমে পারস্য, মিশর ও রোডেশিয়া প্রভৃতি দেশ আশ্বক্রান্ত নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

মধ্যপ্রাচ্য জর্ডন নদীতীরে প্রাপ্ত এবং জেরিকো শহরে রক্ষিত দেবী মূর্তিটি সাত হাজার বছরের পুরনো বলে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মনে করেন। সুদূর মিশর দেশে মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। তিনি আইসিস নামে পরিচিতা। গ্রিস দেশে পূজিতা দেবী অ্যাথেনা। খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতকে প্রাপ্ত অ্যাথেনাদেবীকে রণসাজে সজ্জিতা দেখতে পাওয়া যায়। পারস্যদেশে পূজিতা দেবীর নাম ছিল মাগনামাতের এবং তিনি সিংহবাহিনী।

শক্তিমঙ্গল তন্ত্রানুসারে ভারত উপমহাদেশও তিন ভাগে বিভক্ত। বিন্ধ্যাচল থেকে চট্টলভূমি পর্যন্ত প্রদেশ বিষ্ণুক্রান্তা, বিন্ধ্যাচল থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত অশ্বক্রান্তা বা গজক্রান্ত এবং বিন্ধ্যাচল থেকে নেপাল, মহাচিন প্রভৃতি দেশ রথক্রান্ত নামে বিখ্যাত ছিল।

মধ্যযুগে সমগ্র ভারত তান্ত্রিক সাধনায় প্লাবিত হয়েছিল। তখন প্রায় প্রতিটি তীর্থস্থানে দেবীপূজা হতো। আমাদের উত্তর - পূর্বাঞ্চলেও অসংখ্য দেবী আরাধনার কেন্দ্র বর্তমান।

মহাভারতের ৫১টি দেবীপীঠস্থানেও তিনটি উত্তর - পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। গুয়াহাটি শহরের নীলাচল পাহাড়ের কামাখ্যা ক্ষেত্রে সতীর যোনিদেশ পড়েছিল বলে কথিত আছে। মেঘালয় রাজ্যের জয়ন্তীয়া পাহাড়ে বাউরডাঙা গ্রামে জয়ন্তী মন্দির অবস্থিত। এখানে দেবীর বাম উরু পড়েছিল। ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়পুরের অদূরে মাতাবাড়িতে অনুচ্চ পাহাড়ি টিলার উপর অবস্থিত দেবী ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির। এখানে সতীর পা পড়েছিল বলে ভক্তদের বিশ্বাস। পীঠ তিনটির অধিষ্ঠাত্রী দেবীদের নাম বিভিন্ন হলেও তাঁরা দুর্গারই পৃথক রূপ।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ দেবীকে সর্বশক্তিমতী বিশ্বপ্রসবিণীরূপে বর্ণনান্তে আরও বলেন, সেই দেবীকে কেউ শক্তি, কেহ উমা, কেউ বা লক্ষ্মী বলে থাকেন। ভারতী, গিরিজা, অম্বিকা, দুর্গা, ভদ্রকালী, চণ্ডী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী,

বারাহী প্রভৃতি নামেও তিনি অবহিতা। অসম তথা উত্তর - পূর্বাঞ্চলে আমরা তাঁকে আরও অন্য নামে দেখতে পাই। যেমন, কামাখ্যা, উগ্রতারা, জয়ন্তী, কাঁচা খাউরি, কেঁচাই খাতি ইত্যাদি।

উপরোক্ত তিনটি শক্তিপীঠ ছাড়াও অসম তথা উত্তর -পূর্বাঞ্চলে আরও দেবী দুর্গার আরাধনা কেন্দ্র পাওয়া যায়।

আর্যগোষ্ঠীভুক্ত এবং বিস্তৃত শিরস্ক লোকদের অসমে প্রবেশের পূর্বে যে কিরাত বা গিরিজনরা এখানে বাস করতো, তাদের অধিকাংশই ছিল শাক্ত, শৈব। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অরুণাচলের সিয়াং জেলার মালিনীথানে শক্তিরূপে পূজিত হতেন দশভূজা দুর্গা বা পার্বতী। কালিকা পুরাণে বর্ণিত কেঁচাই খাতি (যিনি কাঁচা মাংস খান) দেবী পূজিত হন লখিমপুরের কর্চনাবাকল গ্রামের তাম্রেশ্বরী মন্দিরে। কাছাড় জেলার কুম্ভীরগ্রামে এখনও পূজিত হন কাঁচাখাউরি দেবী। কাছারী দ্বারা এই দেবীর পূজা হয়ে আসছে ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। নগাঁও জেলার হাতিমারা মন্দিরের দশভূজা দেবী প্রতিষ্ঠাকাল নব শতাব্দী। কামাখ্যাদেবী ব্যাতীত গুয়াহাটি শহরে আরেক জাগ্রত দেবী হলেন উগ্রতারা। তাঁর পূজা হয়ে আসছে একাদশ শতাব্দী থেকে। গোয়ালপাড়া জেলার মোরনইর নিকট শ্রীসূর্য পাহাড়ে দুর্গামূর্তির আবিষ্কার প্রমাণ করে যে এখানে দেবীপূজার প্রচল ছিল মেচ্-রাজবংশী রাজাদের সময় থেকে। মঙ্গলদৈয়ে প্রাপ্ত দশভুজা দুর্গার সমকাল মধ্যযুগের শেষের দিকে। আর যে সব শক্তিসাধনা কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গেছে তা হলো মিকির পাহাড়ের দেবীমন্দির, জয়ন্তিয়ার ফালজুর মঠ, মেঘালয়ের কপিলী নদীতীরের শক্তিপীঠ। এইসব পীঠে নরবলির প্রচলন ছিল।

উপরোক্ত সমস্ত শক্তি আরাধনা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা কিরাত বা গিরিজন সম্প্রদায়ের রাজা-মহারাজা। তাম্রেশ্বরী মন্দিরের পূজারী এখনও অব্রাহ্মণ চুতীয়া বা দেউরী। লখিমপুরের শাক্ত বারো - ভূঁইয়াগন 'তাম্রাক্ষরী' নামে এমন এক তন্ত্রপুঁথির অধিকারী ছিলেন যে, এই পুঁথির নানা প্রকার গুহ্যমন্ত্র দ্বারা দেবী তামেশ্বরীর তুষ্টি সাধন করতে সক্ষম হতেন বলে কথিত আছে।

প্রাচীনকালে সমগ্র ভারতে ধাতু, কাঠ বা পাথর দিয়ে নির্মিত মূর্তিপূজাই সমধিক প্রচলিত ছিল।

এতক্ষণ বলা হলো দুর্গাপূজা বা দেবী আরাধনার কথা। দুর্গোৎসবের ইতিহাস বেশি দিনের না হলেও আজকের দিনে যে জাঁকজমকপূর্ণ দুর্গোৎসব ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পালিত হয়ে, তার শুরু হয়েছিল তিনশ বছর পূর্বে।

জনসাধারণের বিশ্বাস, দুর্গোৎসব নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বারাই আরম্ভ হয়। কিন্তু এই প্রবাদ ভিত্তিহীন। ঐশ্বর্যের জৌলুস দেখিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রতিযোগিতা চলত সেকালের রাজা - জমিদারদের মধ্যে। দুর্গাপূজা ছিল এই জৌলুস দেখানোর একটি মাধ্যম। তবে পূজা একদিনেই শেষ, তাই প্রতিযোগিতা খুব একটা জমতো না। তাছাড়া শুধু পূজায় জৌলুস দেখানো সম্ভব নয়। চাই উৎসব।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজপুরোহিত পণ্ডিত সমেশ শাস্ত্রী শরৎকালে পাঁচ দিন ব্যাপী দুর্গোৎসবের পূজাপদ্ধতি রচনা করেন। রাজা উদয়নারায়ণ শুরু করেন দুর্গোৎসব। ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুকভট্টের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ দুর্গোৎসবের নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে তাঁর প্রতিপত্তি জাহির করেন।

এর পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে রাজা - জমিদারগণ তাঁদের প্রতিপত্তি জাহির করতে থাকেন দুর্গোৎসবের মাধ্যমে। পলাশির যুদ্ধের সময় কিছু ধনী বাঙালি ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন তাঁদেরই একজন। ১৯৫৭ সনের ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধে যখন কোম্পানির জয় হয়, তখন তাঁরা সেই জয়কে মনে করেছিলেন নিজেদের জয়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সে - বছর বিজয়োৎসব পালন করেছিলেন দুর্গোৎসবের মাধ্যমে। তাঁর দেখাদেখি অন্যান্য রাজবাড়িতেও সাড়ম্বরে দুর্গোৎসব পালিত হয়।

দেশ যখন ইংরেজের হাতে চলে গেছে, তখন রাজা - মহারাজারা সাহেবদের নিমন্ত্রণ করতেন দুর্গাপূজাতে। সেকালের দুর্গোৎসবে বাইজি নাচের সঙ্গে সাহেববরণেরও চল ছিল। সাহেবরা ধর্মে খ্রিস্টান, মূর্তিপূজায় অবিশ্বাসী। কাজেই দুর্গাঠাকুর দেখিয়ে তাঁদের মন ভোলানো যেতো না। এজন্য দরকার হতো প্রচুর খানাপিনার আর নাচগানের। উৎসবের উদ্যোক্তারা সাহেবদের ফল - ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা করতেন। 'পশ্চিমা' বাইজিদেরও নাচগানের ব্যবস্থা থাকতো। পূজায় মোট ব্যায়ে নব্বই শতাংশ বরাদ্দ হতো খাওয়া - দাওয়া এবং নাচ - গানের জন্য।

জমিদারী প্রথা বিলোপের পর দুর্গোৎসবের দায়িত্ব চলে আসে সর্বজনীন পূজা কমিটিগুলির উপর। তার আগেও দু -একটা সর্বজনীন দুর্গাপূজা কলকাতায় শুরু হয়েছিল বলে খবর পাওয়া যায়।

আসামের দুর্গোৎসবের ইতিহাস বাংলার প্রায় সমসাময়িক। পশ্চিমের ঢেউ আসতে যেটুকু সময় লেগেছে সেটুকুই ব্যবধান।

আজকাল ভারত তথা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সর্বজনীন পূজাকমিটি দ্বারা দুর্গোৎসবের আয়োজন হয়ে থাকে। এসব পূজামণ্ডপে পূজারীর আসনে বসে পুরোহিত মহাশয় ষষ্ঠী থেকে বিজয়া পর্যন্ত 'রাবণস্য বিনাশায় রামস্যানুগ্রহায়চ অকালে বোধিতা দেবী' ইত্যাদি মন্ত্রযোগে দেবীর আরাধনা করেন। আর দেবীর ভক্তরা অর্থাৎ পূজাকমিটির কর্মকর্তাগণ দেবীকে তুষ্ট করার চেষ্টা করেন সময়োপযোগী কিছু কার্যসূচির মাধ্যমে।